নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ, প্রয়োজন যথাযথ পদক্ষেপ

ম. জাভেদ ইকবাল

ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন রেবেকা (ছদ্মনাম)। বিয়ের সাত বছর পরেও স্বামীর নানারকম নির্যাতনের শিকার হন এই নারী। স্বামী তাকে অনেক সময় সন্তানদের সামনেই চড়-থাপ্পড় দেন আর নিজের মনের মতো কিছু না হলেই গালাগালি করেন। এই নারী একটি গণমাধ্যমকে বলেন, "বিয়ের পর যহন জামাই মারতো, গালাগালি করতো, সবাই কইতো-ব্যাডা মাইনষ্যের রক্ত গরম। ও একটু মারবোই। নতুন নতুন বিয়া হইছে, কষ্ট পাইতাম। কিন্তু এহনো স্বামীর একই অবস্থা। আচারণে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। আমি পড়ালেখা করি নাই, স্বামী মারলে কই যামু? কিন্তু যেসব আপাগো, স্যারগো বাড়িতে কাজ করি, হেগো অনেকের বাড়িত একই অবস্থা দেহি। তখন খুব খারাপ লাগে। ভাবি, একজন মানুষ কেন আরেকজনরে গায়ে হাত দিবো, গালাগালি করবো।”

এক সময়ে নেশা করতেন শিরিনার (ছদ্মনাম) স্বামী। স্নাতকোত্তর করা শিরিনার স্বামী এখন নেশা থেকে বেরিয়ে ব্যবসা করছেন। সংসারের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামতের তেমন গুরুত্ব দেন না তিনি। গণমাধ্যমকে শিরিনা বলেন, "সংসারের একটি বিষয়ে তার মা ও বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমি কথা বলতে গেলে তাদের সামনেই চড়-থাপ্পড় দেয় আর গালাগালি করেন। এই ঘটনার পরে মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিলাম। যাদের সামনে এমন ঘটনা ঘটলো, তারাও ছিল নিশ্চুপ। নিজের পরিবারকে বলায় তারা বলল, নিজের ঘরের কথা ঘরে থাকাই ভালো।”

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানুয়ারি-জুলাই ২০২৫ সময়ে অন্তত ৩৬৩টি পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে; নিহত হয়েছেন ৩২২ জন নারী, যার মধ্যে অন্তত ১১৩ জনকে হত্যার অভিযোগ সরাসরি স্বামীর বিরুদ্ধে। হিসাব বলছে, যেখানে মামলা হয়েছে ৬৪টি আর বাকি ৬৯টি হত্যায় মামলার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠানটির পরিসংখ্যান বলছে, স্বামীর পরিবারের সদস্যদের হাতে নির্যাতনের পর মৃত্যুর চিত্রও ভয়াবহ। জুলাই মাস পর্যন্ত ৪২ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যান। মামলা হয়েছে ১৮টি, আর এখানেও ২৪টি ঘটনায় মামলার তথ্য নেই। আরো দেখা গেছে, এ সময়ের মধ্যে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১৭ জন নারী। এর মধ্যে মামলা করেছেন ৬ জন এবং মামলার তথ্য নেই ১১টি ঘটনায়। একইভাবে স্বামীর পরিবারের সদস্যদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭ জন। মামলা হয়েছে ৪টিতে, বাকি ৩টি ঘটনায় মামলা হয়নি।

নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে ৩৩ জন নারীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আর নির্যাতিত হয়েছেন ১৭ জন। হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৪টি, আর মামলার তথ্য নেই ১৮টিতে। নির্যাতনের ঘটনায় মামলা করেছেন ৭ জন, পাশাপাশি ১০ জন নারী মামলা করেননি। এছাড়া জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছেন নির্যাতনের শিকার ১১৪ জন নারী। সব মিলিয়ে মামলা হয়েছে ১৫০টি, মামলা হয়নি ২১৪টি ঘটনায়। অর্থাৎ, নির্যাতন বাড়লেও এ অপরাধের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা তুলনামূলক কম।

অন্যদিকে আসক-এর ২০২৪ সালের জানুয়ারি-জুন পর্যায়ের (অর্থাৎ গত বছরের প্রথম ছয় মাস) তুলনামূলক চিত্রও গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়কালে আসক-এর প্রকাশিত পরিসংখ্যানে পারিবারিক সহিংসতার ২৬৯টি ঘটনা ধরা পড়ে। সেখানে স্বামীর হাতে খুন ৮৪ জন এবং আত্মহত্যা করেন ৯৪ জন। অর্থাৎ, চলতি বছরের একই সময়কালে (এবং জুলাই যুক্ত হলে) ঘটনার যেমন সংখ্যা বেড়েছে, তেমনি মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে বেড়েছে। এক অর্থে বাড়ির ভেতরের সহিংসতা আরো প্রাণঘাতী হয়েছে।

শুধু সংখ্যানির্ভরতার বাইরে, জাতীয় হেল্পলাইনগুলোর চিত্রও শঙ্কার। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বলছে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০৯ নম্বরে জানুয়ারি-জুলাই ২০২৫ সময়ে শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ২৯ হাজার ১৬১টি এবং মানসিক নির্যাতন সংক্রান্ত ১৯ হাজার ৫৮৪টি কল রেকর্ড হয়েছে-যদিও ১০৯ ‘ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স' আলাদা ক্যাটাগরি হিসেবে চিহ্নিত করে না। পুলিশের ৯৯৯ নম্বরে একই সময়ে স্বামীর সহিংসতার অভিযোগ করে ৯ হাজারের বেশি কল এসেছে।

দেশের অন্যতম প্রাচীন নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মাসওয়ারি (জুলাই ২০২৫) নির্যাতন-চিত্র দেখায়, মাসজুড়ে নারী ও কিশোরীর ওপর সহিংসতার অভিযোগের সংখ্যা কয়েক শততে পৌঁছেছে-যা চলতি বছরের ‘উচ্চমাত্রার' ধারাবাহিকতাকেই ইঙ্গিত করে। সংগঠনের এই মাসিক চার্ট মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত মামলার ধরন, বয়সভিত্তিক বণ্টন ও সহিংসতার প্রকৃতি (শারীরিক, মানসিক, যৌন, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) আলাদা করে তুলে ধরে। জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এক হাজার ৫৫৫ জন নারী ও কন্যা। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২২ জন নারী। আর হত্যা করা হয়েছে ৩২০ জন নারীকে। পাশাপাশি শুধু জুলাই মাসেই বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৫ জন নারী ও কন্যা।

বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যায় পারিবারিক সহিংসতা বাড়ার যে কারণগুলো বারবার উঠে আসে, সেগুলো হলো, পারিবার-সামাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, ন্যায়বিচারের পথে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও ভীতি, আইনের প্রয়োগের অভাব, পুলিশ-প্রশাসনের অবহেলা এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়া। আর অপরাধীরা এ দুর্বলতাগুলোরই সুযোগ বারবার নিচ্ছে। এ কারণে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা গত সাত মাসে মারাত্মক উদ্বেগের অবস্থায় চলে গেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

গত কয়েক মাসের যে ভয়াবহ চিত্র দেখা যাচ্ছে, তার পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদাসীনতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব অন্যতম বলা চলে। বর্তমান

সময়ে এই অপচর্চাগুলো এতটাই বেড়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা শাস্তি পায় না। ফলে, তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সরকার কেন নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে পারছে না- তার মূল কারণই এগুলোই বলে ধরা হয়।

বাংলাদেশে পারিবারিক নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা একাধিক আইনের সহায়তা নিতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০। এই আইনে নারী ও শিশু উভয়ই সুরক্ষার আওতায় আসে। ভুক্তভোগী আদালতের মাধ্যমে সুরক্ষা আদেশ, বাসস্থানে থাকার অধিকার, ভরণপোষণ ও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন।

পারিবারিক সহিংসতা আইন অনুযায়ী, পরিবারের মধ্যথেকে নারী বা শিশুর ওপর শারীরিক, মানসিক, যৌন অথবা আর্থিক ক্ষতি করলে তা পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে গণ্য হবে। আইনে বলা হয়েছে, শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে আঘাত, বলপ্রয়োগ বা জীবনের ক্ষতি; মানসিক নির্যাতনের মধ্যে মৌখিক অপমান, ভয়-ভীতি ও হয়রানি; যৌন নির্যাতনের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বা জোরপূর্বক যৌন আচরণ; আর্থিক নির্যাতনের মধ্যে আইনগত প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য না দেওয়া কিংবা ভুক্তভোগীর সম্পত্তি অনুমতি ছাড়া হস্তান্তরের মতো কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), যা শারীরিক, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, অঙ্গহানি, এমনকি হত্যার চেষ্টার মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনে কঠোর শাস্তি, যেমন, যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ডের বিধানও রয়েছে। তবে আইনি প্রতিকার পাওয়ার জন্য নারীকে থানায় গিয়ে মামলা করতে হয়। যেখানে আছে পুলিশি অবহেলা, সামাজিক প্রভাব ও ক্ষমতাবানদের চাপ। ফলে আইনগুলো ক্ষতিপূরণ, আশ্রয় ইত্যাদি নিশ্চিতে অগ্রগামী হলেও বাস্তবে আইন প্রয়োগে বড়ো শূন্যতা থেকে যাচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এর মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম; নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচি; মহিলা সহায়তা কর্মসূচি; মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কর্মসুচি; নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এনজিও সমূহের তালিকা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন পরিচালনা করছে। একই সাথে দেশের দুঃস্থ, অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও নিরাপদ আশ্রয় প্রদান এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর অধীনে দুঃস্থ, অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ প্রদান, পারিবারিক কলহ মিমাংসা, পারিবারিক সম্পর্ক পুন:স্থাপন, স্ত্রী ও সন্তানের ভরনপোষণ আদায় ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের দেনমোহর, সন্তানের ভরণপোষণ আদায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না, নির্যাতিত মহিলাদের পক্ষে সেলের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা হয়। আবার, নির্যাতিত ও আশ্রয়হীন মহিলাদের বিনা খরচে অভিযোগ/মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৬ মাস, বিশেষ প্রয়োজনে এক বছর আশ্রয় প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিনা খরচে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আরও সেবার মধ্যে গাজীপুরে রয়েছে মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র। আদালত কর্তৃক প্রেরিত হেফাজতীদের বিচার চলাকালীন আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয়, বিনা খরচে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা। নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা, কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা এবং আশ্রয়কালীন তাদের দক্ষ জনসম্পদে পরিনত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০৩ সাল থেকে হতে ২০২১ সালের আগষ্ট পর্যন্ত মোট ২১০৮ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের পেছনে রেখে সমাজ তথা দেশ এগোতে পারে না। নারীদের জন্য সমানাধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি যতদিন উপেক্ষিত থাকবে, ততদিন নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হওয়া কঠিন। তাই সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীদের জন্য ন্যায়ানুগ পরিবেশ গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

#

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার